ENSEMBLE
A bi-lingual peer reviewed academic journal
ISSN: 2582 - 0427 (Online)
Vol. 3, No. 1
March, 2021
http://www.ensembledrms.in

Article Type: Research Article
Article Ref. No.: 21010600471DF
https://doi.org/10.37948/ensemble-2021-0301-a023

গৌড়বঙ্গের লোকসাহিত্য : প্রসঙ্গ কৌতুকরস

(GOURBANGER LOKOSAHITYA: PROSANGO KOUTUKROS)

Dipak Chandra Barman[1]✉

প্রবন্ধসার:

সাহিত্যের নবরসরত্নের মধ্যে দ্বিতীয় রত্ন হাস্যরস। 'হাস' স্থায়ী ভাব থেকে এর উদ্ভব। হাস্যরসের বিভিন্ন উপধারার মধ্যে অন্যতম হল কৌতুকরস (Fun)। হাসির সঙ্গে পৃথিবীর যে কোনো স্থানের, যে কোনো বয়সের মানুষের যোগ অচ্ছেদ্য। অবশ্য আধুনিক-উত্তর সময় পর্বে এই পরম্পরাগত সত্য জিজ্ঞাসা চিহ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। আবার এও সত্য আমাদের হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা পাওয়া-না পাওয়া, যূথবদ্ধতা-নিঃসঙ্গতা, পারস্পরিক বিনিময়-পরশ্রীকাতরতা সহোদরার মতো সমান্তরাল স্রোতধারায় প্রবহমান। তবে একুশ শতকের যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত জীবন ভাবনায় 'সকল লোকের মাঝে ব'সে/ আমার নিজের মুদ্রাদোষে/ আমি একা হতেছি আলাদা?'— এই জিজ্ঞাসা চিহ্নের অঙ্কুশাগ্র নাগরিক জীবনের পাশাপাশি গ্রাম জীবনকেও মাত্রাধিক্যে বিদ্ধ করার প্রবণতা লক্ষণীয় ভাবে ক্রমবর্ধমান।

সভ্যতার 'অস্বাভাবিক' অগ্রগতির ফলে মানুষ ক্রমশ হাসতে ভুলে যাচ্ছে অথচ হাসি মনুষ্য-বৃক্ষের শেকড়। শেকড়কে উপড়ে ফেলে বৃক্ষে জল সিঞ্চন— কালিদাসীয় পথ অনুসরণ। পরিবেশকে সজীব রাখার জন্য যেমন এক একটি বৃক্ষ নয় বনাঞ্চল প্রয়োজন তেমনি মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষের যূথবদ্ধ সামাজিক পরিচয় প্রয়োজন। লোকায়ত জীবন এখনো নিজস্ব স্থানিক সংস্কৃতিকে লালন করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের বহুস্বরিক আনন্দকে যেভাবে টিকিয়ে রেখে চলেছেন তা নাগরিক 'সভ্য সমাজে'র কাছে শিক্ষণীয়। এমন সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লোকসাহিত্যে কৌতুকরস প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তবে আলোচনার অভিমুখের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বর্তমান প্রবন্ধ গৌড়বঙ্গ অর্থাৎ দুই দিনাজপুর ও মালদহের লোকজীবন ও সাহিত্যের কৌতুকরস প্রসঙ্গ আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে।

সূত্রশব্দ (Keywords) : হাস্যরস, দিনাজপুর, মালদহ, মনুষ্য-বৃক্ষের শেকড়, স্থানিক সংস্কৃতি, বহুস্বরিক আনন্দ

সাহিত্যের নবরসরত্নের মধ্যে দ্বিতীয় রত্ন হাস্যরস। 'হাস' স্থায়ী ভাব থেকে এর উদ্ভব। হাস্যরসের বিভিন্ন উপধারার মধ্যে অন্যতম হল কৌতুকরস (Fun)। "হাস্যরসের অবারিত ও অনর্গল উচ্ছ্বাস পাওয়া যায় কৌতুকরসে। কৌতুকের হাসি কোনো বাধাবন্ধন মানে না, কোনো চিন্তাভাবনার পরোয়া করে না, কোনো প্রচ্ছন্ন মত ও সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যও সাধন করতে চায় না। ঘটনা ও চরিত্রের অতিরঞ্জন ও উদ্ভটত্ব থেকেই কৌতুকের হাসি উৎসারিত হয়।"[১] হাসির সঙ্গে পৃথিবীর যে কোনো স্থানের, যে কোনো বয়সের মানুষের যোগ অচ্ছেদ্য। একটি শিশু মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীর আলোর সান্নিধ্যে আসা মাত্র কেঁদে ওঠে ! কিন্তু পরক্ষণেই মাতৃক্রোড়ের ওম-আনন্দে, আত্মজন-পরিজনের সান্নিধ্যক্রমে সে যে সুখানুভূতি উপলব্ধি করে তা তার নির্মল হাসির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। মানবজীবনের হাসির এই অভিযাত্রা চলতে থাকে জীবনভর। আবার সমাজ-সংসারের গোলক-ধাঁধার নানা জটিল, বন্ধুর পথ পরিক্রমায় মানুষ জীবনের সেই সহজাত ছন্দ— সহজ-অর্জিত পথ ভুলেও যায়। প্রত্যকের ভেতরে অথবা বাইরে ওঁত পেতে বসে থাকা শয়তান-শক্তি হাসির কণ্ঠরোধ করে শ্বাসরুদ্ধ পরিমণ্ডলের মুক্ত-বদ্ধ পরিবেশে ঠেলে দেওয়ার প্রয়াস জারি রাখে। ২০১৯ সালে উত্তর দিনাজপুরের জেলা শহর রায়গঞ্জে অভিনীত কলকাতার 'প্রাচ্য' প্রযোজিত নাটক 'খেলাঘর'-এর একটি দৃশ্যে ড. রক্ষিতের একটি সংলাপ থেকে একটি সাধারণ সত্য উঠে আসে— মানুষ ক্রমশ হাসতে ভুলে যাচ্ছে। মানুষের মনে আর সেই দমফাটা হাসি নেই। বাইরে যে মানুষকে হাসতে দেখা যায় তা আসলে তার বাহ্যিক সত্তার হাসি— মুখোশের হাসি। মানুষ ক্রমশ একা হতে হতে, নিঃসঙ্গ হতে হতে হাসি-হারা এক জগতে বিরাজ করছে। ফলত নিঃসঙ্গ হাসি-শূন্য পরিবারে প্রত্যেক মানুষ

1 [Author] ✉ [Corresponding Author] Associate Professor, Raiganj University, Raiganj, Uttar Dinajpur, 733134, West Bengal, INDIA. E-mail: idipakbarman@gmail.com

© 2021 Ensemble; The author

This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

শরীরের রোগের থেকে বেশি মনের রোগের আক্রান্ত। আমন্ত্রিত অতিথির মত প্রবেশ করছে কার্ডিয়াক অ্যাটাক। সুকুমার রায়ের অত্যন্ত পরিচিত ছড়াটির সেই চার পঙ্ক্তি—

"রাম গড়ুরের ছানা
হাসতে তাদের মানা,
হাসির কথা শুনলে বলে,
'হাবস না-না না-না'।"[২]

আসলে আমাদের হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা পাওয়া-না পাওয়া, যূথবদ্ধতা-নিঃসঙ্গতা, পারস্পরিক বিনিময়-পরশ্রীকাতরতা সহোদরার মতো সমান্তরাল স্রোতধারায় প্রবাহমান। তবে একুশ শতকের যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত জীবন ভাবনায় 'সকল লোকের মাঝে ব'সে/ আমার নিজের মুদ্রাদোষে/ আমি একা হতেছি আলাদা?'[৩] — এই জিজ্ঞাসা চিহ্নের অঙ্কুশাগ্র নাগরিক জীবনের পাশাপাশি গ্রাম জীবনকেও মাত্রাধিক্যে বিদ্ধ করার প্রবণতা লক্ষণীয় ভাবে ক্রমবর্ধমান। এমন সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লোকসাহিত্যে কৌতুকরস প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আলোচনার অভিমুখের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বর্তমান প্রবন্ধ গৌড়বঙ্গ অর্থাৎ দুই দিনাজপুর ও মালদহের লোকজীবন ও সাহিত্যের কৌতুকরস প্রসঙ্গ আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবে।

হাস্যরস-কৌতুকরসের সংজ্ঞা, পরিচিতির প্রচলিত বিবরণে না গিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বিভাগগুলি হল ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, লোককথা, লোকসংগীত, লোকনাটক, লোকপুরাণ ইত্যাদি। লোকসাহিত্যের এইসব প্রকরণের সঙ্গে গ্রামীণ জনজীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহের পাশাপাশি বিনোদনের সম্পর্ক গভীর। ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম প্রাচীন ধারা হয়েও অনেককাল বৌদ্ধিক আলোচনায় উপেক্ষিত থেকেছে। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোক-সাহিত্য' (৫ম খণ্ড) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিছুটা অনুযোগ এনেছেন। পরবর্তীকালে অবশ্য এর প্রতি উদাসীনতার ভিন্ন কারণ যেমন উঠে এসেছে তেমনি গুরুত্বও স্বীকৃতি পেয়েছে। "প্রাচীনকালে ধাঁধার ব্যবহারিক উপযোগিতা লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় কম তো ছিলই না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশিই ছিল স্বীকার করতে হয়।"[৪] বিষয়গত বিবেচনায় ধাঁধা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত।

"ঝাড়বাড়ি ত্যা নিকিল ভুতু / ভুতু কহচে ভাতত মুতু।"[৫] দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত এই ধাঁধাটিতে কে সেই 'ভুতু'— হেঁয়ালির উত্তর না জানা পর্যন্ত শ্রোতা কৌতুকবোধে আবিষ্ট থাকেন। এই কৌতুক আবহের মূলে রয়েছে 'ভুতু'র অনুপ্রাস হিসেবে 'মুতু' শব্দের ব্যবহার। "ধুমসি মাগি হাটত যায় / নিষ্টাতে নিষ্টাতে জান যায়।"[৬] ধাঁধাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষকামী পুরুষ কৌতুক রসসিক্ত হয়ে পুলকিত বোধ করলে দোষ কী ! কিন্তু পরক্ষণে হেঁয়ালির অবসান ঘটিয়ে যখন উত্তর জানা যায়— 'লাউ' তখন আরেক লঘু কৌতুক আবহের উদ্রেক ঘটে। দিনাজপুর অঞ্চলে নটুয়া গানে প্রচলিত সমগোত্রীয় আরো দুটি ফাকরি বা ধাঁধার উল্লেখ করা যাক—

ক. "যাইতে নাগাউ আইসতে নাগাউ দশের মাঝে
সুট করি খুলাই নিলে খাং খাং করি থাকে।"

উত্তর : জুতো

(সংগৃহীত)

খ. "মোটা মাগি হাট যায় গুমুর গুমুর করি
মাঝ হাটত যাই ধুমুস করি বইসে
আড্ড (অর্ধেক) ঢুকিলে মাগি ক্যাকের-ম্যাকের করে
গোটায় ঢুকিলে মাগি ফ্যাকেত করি হাসে।"

উত্তর : রমণীদের শাঁখা পরা

(সংগৃহীত)

উল্লেখ্য নটুয়ায় ব্যবহৃত ফাকরির বাহ্যিক অর্থে কোনো না কোনো একটি অশ্লীল ইঙ্গিত থাকে। এই অশ্লীল অর্থ দ্যোতনার মধ্য দিয়ে রঙ্গরস প্রকাশ পায়। বাচ্যার্থ বিশ্লেষণের পর মূল গিদাল গানের সুরতরঙ্গে উপস্থিত শ্রোতাদের প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যান। মালদায় মুসলমান শেরশাহ্‌বাদ-পেঁচি-সহ অন্যান্য বাংলা ভাষীক অঞ্চলের কৌতুক রসাশ্রয়ী দুটি ধাঁধা—

ক.　　　　　“আট ভাই, একখান চামড়া
এক পা, সেও লেংড়া।”[৭]

উত্তর : ছাতা

খ.　　　　　“হেকোড় কুঁজা খুঁড়ে মাটি,
দশ পাউ তিন পুকোটি।”[৮]

উত্তর : চাষি, বলদ ও লাঙল

এই জেলার দ্বারবঙ্গীয় খোট্টা ভাষীকদের মধ্যে প্রচলিত ছড়ায় নির্মল কৌতুকরসের প্রতিফলন ঘটেছে এভাবে—

ক.　　　　　“চিড় দিয়া, ফাড় দিয়া, দাল দিয়া ঘি,
উস্‌মে লাল দিয়া বুঝাউ তো কি ?”[৯]

উত্তর : সিথির সিঁদুর

খ.　　　　　“লাল গাই হাটে যায়,
মার খেতে খেতে জান যায়।”[১০]

উত্তর : মাটির হাঁড়ি

শেষোক্ত ধাঁধাটির দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি এলাকায় একটু রূপভিন্নতা লক্ষ করা যায়—

“মোটা মাগি হাট যায়
গালে মুখে চর খায়।”

(সংগৃহীত)

প্রবাদ হল খোয়া ক্ষীর— গ্রামজীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা অর্জিত ঘন নির্যাস। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদগুলি কোনো ব্যক্তি চরিত্র বা কোনো বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত সংক্ষিপ্ত বাক্যবন্ধে প্রকাশিত লোকায়ত দর্শন। প্রতিটি প্রবাদ বাক্যই লোকজীবনলগ্ন কোনো না কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। বাংলা প্রবাদ চর্চার ইতিহাসে উইলিয়াম মর্টন (‘দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ’ – ১৮৩২) ও জেমস লঙ্(Bengali Proverbs – 1851, প্রবাদমালা - ১৯৬৮)-এর নাম প্রাতঃস্মরণীয়। লঙের মতে, “A Proverb is a spark thrown up from the depths beneath.”[১১] দিনাজপুরে প্রচলিত একটি প্রবাদ—

“বিলের চপরা (ধুতুরা/খলসে মাছ)
বাড়ির বাইগন
কুইনা জুরবা তানে বুড়হাট
ধরিছে নাচন।”

(সংগৃহীত)

প্রবাদটি শোনার মুহূর্তে দীনবন্ধু মিত্রের ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ প্রহসনটির কথা স্মরণে আসে। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, গৌরী দানের মত সামাজিক ‘ব্যাধি’র সংক্রমণ একসময় প্রবাদ বাক্যরূপ নেয়। এই সামাজিক ব্যাধি কেবল মাত্র রাজা-রাজরা, জমিদার-জোতদার, কুলীনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এমনটা নয় লোকজীবনের মধ্যেও তা সমাজ স্বীকৃত প্রথা হিসেবে প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। কোনো কোনো পরিবারে বংশ পরম্পরায় বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহের মত প্রথাকে গৌরবের সঙ্গে টিকিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ করা যেত। বিবাহে নারী-পুরুষের বয়স বৈষম্য ছিল স্বাভাবিক। লোকায়ত জীবনের এইসব যাপন চিত্র থেকে উপরোক্ত প্রবাদটির উদ্ভব। প্রবাদটি লঘু কৌতুকরস ও স্যাটায়ারের সম্পৃক্ততায় হয়ে উঠেছে এক বিশেষ সময়ের দলিল। কৌতুকের আবেশে ভীমরতিপরায়ণ পুরুষ তথা সমাজের এক নির্লজ্জ নির্মম চিত্র ফুটে ওঠে। একই সমাজ চিত্রের প্রতিফলন রয়েছে দিনাজপুরের গাঁ-গঞ্জের ‘গুগল সার্চ’ থেকে তুলে আনা এমন আরও ক’টি প্রবাদ উল্লেখ করা যাক —

ক.　　　　　“নিন্দুরের (ইঁদুর) যখন ধান হয়
সাতবার বেহা করে।”

(সংগৃহীত)

খ.　　　　　“বুড়ানি বয়সে মেহেন্দির রস
মেহেন্দি করে টস টস।”　　　　　(সংগৃহীত)

গ. "দাঁত নাহি বুড়াটর
খাবা চাচে চুড়হা
উড বুড়া খাবা চাচে মুড়ি
বেহা করবা চাহে
গাভুর গাভুর ছুরি।"[১২]

লোকছড়া হল 'সহজ-সরল মনের অনায়াস সৃষ্টি'। ছড়ার সঙ্গে শিশুমন তথা গ্রাম্যজীবনের অনাবিল কৌতুক রসের প্রবাহমান সম্পর্কের ধারা এখনো 'সোতাল'। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' (১৮৯৯), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯), রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) ছড়াচর্চার 'প্রাইমার' হিসেবে স্মরণীয়। ছেলেভুলানো ছড়াকে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালের 'মোহমন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করে গ্রামবাংলায় প্রচলিত যাবতীয় ছড়ার গুরুত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে লিখেছেন— "প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি স্বাদ পাওয়া যায়।"[১৩] গৌড়বঙ্গের গ্রামজীবনে প্রচলিত বলা ভালো অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম ছড়াগুলি গ্রাম্যরস-আস্বাদনের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। ছড়া প্রধানত শিশু-কিশোরের স্বর্গীয় সম্পদ। সুতরাং সেখানে কৌতুকরসের প্রাধান্য অবসম্ভাবী। এই রসধারার গভীরে অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ ইতিহাস, সমাজ বিবর্তন ও স্থানিক সংস্কৃতির অভিজ্ঞান নিহিত থাকে। আপাত 'ননসেন্স' ছড়া সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রচলিত শিশু-কিশোরকেন্দ্রিক কৌতুকাশ্রিত কয়েকটি ছড়া নিম্নরূপ—

১. লোকক্রীড়া বিষয়ক:

ক. "অত বড় পেয়ারা
মেয়েদের কি চেহারা।
রাস্তায় চলে ভ্যান
মেয়েদের কি ঘ্যাম।
ছেলেরা পরে চপ্পল
মেয়েরা পরে হিল।
হিলের ভিতর লেখা আছে
দিল দিবানা দিল।"

(পিঠকুদ্দা খেলা [কুদ্দা – লাফানো], (সংগৃহীত)

খ. "সরস্বতী মা জলে ডুবো না,
জলে আছে পদ্ম ফুল
নষ্ট করো না।
গণেশের প্যাট মোটা,
আলু খায় গোটা গোটা
লবন খায় কম
পাদে ভম্ ভম্।"

(ঐ)

২. ঘুমপাড়ানির গান :

ক. "নিন্দারে ছুয়া, নিন্দারে ছুয়া
শিয়াল আসিবে
ভমা বিলাইট শুনা পালে
খামচায় লিবে।
নিন্দারে ছুয়া, নিন্দারে ছুয়া।"[১৪]

খ. "নিন্দারে নিন্দারে ভাকরের ছুয়া
তর মা গিসে হাট করিবা।

বাঁশের পাতারিত নাড়ু আনবে
ভমা বিলাইড খায়ে নিবে।”

(সংগৃহীত)

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিশেষ বিবাহ অনুষ্ঠানে নারীদের পতি নিন্দা প্রসঙ্গে কৌতুকরস আস্বাদনের সুযোগ ঘটে। ভাঁড়ুদত্ত ও বরবেশী শিব চরিত্র কৌতুকরসের আধার। গৌড়বঙ্গের গ্রাম্য হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের মধ্যে এখনো ‘বেহার গানে’র প্রচলন বিলুপ্তপ্রায় হলেও টিকে রয়েছে। বিবাহের নানা আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেসব গীত গাওয়া হয় সেগুলির অধিকাংশেরই অঙ্গীরস কৌতুকরস। অঙ্গরসের মধ্যে করুণরস উল্লেখযোগ্য। বিয়ের গান প্রধানত দুভাগে বিভক্ত— বরপক্ষের গান ও কন্যাপক্ষের গান। বর, বরপক্ষ, বরযাত্রী ও কারুয়া(ঘটক)-কে কেন্দ্র করে গীত কন্যাপক্ষের গানগুলি কৌতুকরসে ভরপুর। বিবাহ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত পাড়া-পড়শী বয়স্কা রমণীদের সম্মিলিত ভাবে গানের সুরে মেতে উঠতে দেখা যায়। তবে ঝিনচাক ডি.জে. সংস্কৃতির প্রবল আকর্ষণের চাপে গ্রামাঞ্চলের বিয়ের গানের অনাড়ম্বর, অকৃত্রিম আনন্দরস পরিবেশ ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। গানগুলি নিছক আনন্দ-বিনোদনের জন্য গীত হলেও এর মধ্যে সমকালীন সমাজ-ইতিহাস ও নারী মনস্তত্ত্বের যে চিত্র ফুটে ওঠে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

গ্রামাঞ্চলে দশক-কয়ের আগেও শুভদৃষ্টির পূর্বে কন্যার পাত্র-দর্শন সমাজসিদ্ধ ছিল না। শুভদৃষ্টির সময় অপছন্দের বরকেও সমাজ-নিয়তির বিধান হিসেবে মেনে নিতে হত। কন্যার এরূপ কপাল-নির্ভরতাকে কেন্দ্র করে রচিত দিনাজপুরে প্রচলিত একটি বিয়ের গান—

“কালো কালো বাইগন গে
হিরজিরিল পাতা
ঘিয়তঅ ভাজিনু বাইগন গে
খাইবার মধু রস
মাই হল গে সামসুন্দর
ফেরনা কেনে কালো
কালো দেখিয়া মাই, না বসিবে বেহাত
বসগে বসগে মাইগে নিয়তিতে ছিল।
কালুয়া প্যাঁচা দুলাহা তরে বাদে ছিল
বসগে...
বাঙ্গর (বেটে) সাটা দুলাহার তরে বাদে ছিল
বসগে...
ডোনডা (বড়) নাকা দুলাহা...।”

(সংগৃহীত)

মঙ্গলকাব্যে নারীদের পতি নিন্দার প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই কৌতুকরসের ধারা দিনাজপুরের রাজবংশীদের বিয়ের গানে স্থানিক নিজস্বতায় প্রচলিত রয়েছে। এই অঞ্চলের মুসলিম সমাজের মধ্যে প্রচলিত এরূপ একটি বিয়ের গান—

“মাড়ুয়ার তলে বসে গাবুরুরে তোরা হাসেন মনে মনে
কৈইন্নার বাবা বলিয়া ছিল রে আমরা রেডিও দিব দানে
রেডিও দিবা না পারিলে রে কৈন্নার মাইকে দিব দানে
একজন কইরবা আইনে গাবুরু রে তোরা দুইজন পাইলেন দানে।
কৈইন্নার ভাই বলিয়াছিল রে আমরা হাতঘড়ি দিব দানে
হাতঘড়ি দিবা না পারিলে রে কৈইন্নার ভাবিকে দিব দানে।
... ...
একজন কইরবা আইনে গাবুরু রে তোরা দুইজন পাইলেন দানে।”

(সংগৃহীত)

গানগুলি বিবাহে আগত আত্মীয়-স্বজন-পাড়াতুতো বিধবা-সধবা ও বৈরাতিদের কণ্ঠে নিছক কৌতুক আবহে পরিবেশিত হলেও সমকালীন পণপ্রথা তথা সামগ্রিক পরিস্থিতিতে নারীর দৈনন্দিন জীবনের 'নকশিকাঁথা' হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল— কৌতুকরসের অন্তঃস্রোতে 'আত্ম'র প্রতি 'অপরে'র 'মিছরির ছুরি'র আঘাত।

খন যেমন দুই দিনাজপুরের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্পদ তেমনি গম্ভীরা মালদহের। খন গান গম্ভীরা গান আর খন পালা গম্ভীরা পালার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ কোনো বিষয় নির্ভর একক বা সমবেত গান খন গান, গম্ভীরা গান। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া কোনো বিশেষ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কোনো বিশেষ ব্যক্তি কিংবা পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কোনো বাখান বা খন-খিতাল(অবাঞ্ছিত ঘটনা)-কে কেন্দ্র পালা বেঁধে স্থানীয় কোনো পালাকারের রচিত লোকনাটক হল দিনাজপুরে খন পালা। অন্যদিকে মালদহের গম্ভীরা পালার সঙ্গে ধর্মীয় অনুষঙ্গের যোগই বেশি। মূলত চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবে গম্ভীর বা শিব পুজো কেন্দ্রিক লোকউৎসব গম্ভীরা। কিন্তু পরবর্তীকালে "বিশ শতকের দশকে গম্ভীরার গানের বিশিষ্ট রচনাকার মুহম্মদ সুফির হাত ধরেই বর্তমানের আঙ্গিক নিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মকেন্দ্রিক পূজা ও উৎসবকে অতিক্রম করে ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে লোকজীবনের আবাল-বৃদ্ধের মনোরঞ্জনে তথা লোকশিক্ষায় সমর্থ হয়েছে।"[১৫]

প্রসঙ্গত খন পালা, গম্ভীরা পালা উভয়ই গীতাশ্রয়ী লোকনাটক। মালদহে গম্ভীরার পাশাপাশি আলকাপের জনপ্রিয়তা লক্ষণীয়। দিনাজপুরে আলকাপের পরিচিত নাম ছিল পঞ্চরস। এই লোকনাট্যের প্রচলন বর্তমানে উত্তরবঙ্গের কেবলমাত্র মালদহ জেলায় টিকে রয়েছে বলা চলে। দিনাজপুরে খন গানের পাশাপাশি লক্ষ্মীর গান, বন্ধুয়ালা গান, সত্যপীরের গান, খজাগরের গান, জলমাঙা/জলখেলার গান, যুগির গান, হুলি(হোলি)-র গান, কবি গান, বাউল গান, পেটলা-পেটলির গান, গীত কাহিনি, ঝার্ণি গান ইত্যাদি গান এবং খন পালা, আলকাপ যাত্রা (পঞ্চরস), সত্য পীরের পালা, বিষহরা পালা, কৃষ্ণযাত্রা পালা লোকনাটক হিসেবে একসময় গ্রামজীবনের অবসর বিনোদনের সাংস্কৃতিক প্রকরণ হিসেবে জনপ্রিয় ছিল। তুলনামূলক ভাবে খন পালার জনপ্রিয়তা এখনো বজায় থাকলেও টিভি, মোবাইল, হোয়াটস অ্যাপ, ফেসবুক ক্রিকেট-সিরিয়াল, ডি.জে-ধামাকার তাড়ি-রস আসক্ত বর্তমান প্রজন্ম অন্যান্য লোকনাটকগুলি থেকে অনেকটাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে গ্রামাঞ্চলের পারিবারিক-সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে ভাড়াকৃত টি.ভি-ভি.সি.আর-এ সিনেমা দেখার মোহ-আনন্দে রাত্রিজাগরণের মধ্যে দিয়ে এই সংস্কৃতিঘাতী যাত্রা শুরু হয়েছিল। গৌড়াঞ্চলের উল্লেখিত লোকগান ও লোকনাটকগুলিতে দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, ভাব-ভালোবাসা, প্রেম-বিরহ, সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি, আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষার কথা মূলত রঙ্গ-রসিকতা, তামাশা-ইয়ার্কি, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মধ্য দিয়ে উপস্থাপনের রীতি প্রচলিত। এইসব গান, পালা গান লোকমনোরঞ্জনের পাশাপাশি সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক সংস্কার, শিক্ষা, সচেতনতার প্রতিও বিশেষভাবে দায়বদ্ধ। প্রায় শতাব্দকাল পূর্বে মালদহের প্রবাদপ্রতিম গম্ভীরা শিল্পী মোহাম্মদ সুফির হাত ধরে এক বিশেষ ঘটনা সূত্রে শিবের যে কৌতুকপ্রদ 'কোরিওগ্রাফি' সূচিত হয়েছিল সেই লোকমনোগ্রাহী 'formatটি' আজও প্রচলিত।

> "হে দ্যাখ, হো দ্যাখ কারে ডাকতে
> কেডা আইল ভাই রে ?
> ইনি কি স্যার আশুতোষ হাইকোর্টের জজ ?
> গায়ে মাখা কেন ছাই রে ?"১৬

দিনাজপুরের জনপ্রিয় কয়েকটি খন পালা হল নয়ানশোরী, ঢাকোশোরী, ব্রহ্মশোরী / বর্মোশোরী, হালুয়া- হালুয়ানী, মায়্যাবন্ধকী, সতী-হেবলা, খান বাঙালি (খান বেহারী)। পালায় অংশগ্রহণকারী কুশীলবদের পোশাক-আশাক, প্রসাধন-উপকরণ, মেক-আপ, কোনো কোনো পালায় (যেমন হালুয়া-হালুয়ানী, রাম বনবাস) মোখা বা মুখোশের ব্যবহার, দাইমান্ডা মঞ্চ (আগের দিনে উঠোনে ধানের আঁটি বৃত্তাকার উঁচু গদি-মতন বিছিয়ে চার-পাঁচটি গরুর গলায় দড়ি বেঁধে পাশাপাশি সারবদ্ধ করে তাদের কলুর বলদের মত গোলাকারে ঘুরিয়ে ধান মাড়াইয়ের পদ্ধতি লক্ষ করা যেত। এই ধান মারাই পদ্ধতি উত্তর দিনাজপুরে দাইমান্ডা নামে পরিচিত। সেই সূত্রে খনপালা পরিবেশনের উন্মুক্ত বৃত্তাকার এই মঞ্চ উত্তর দিনাজপুরের কোথাও কোথাও দাইমান্ডা মঞ্চ নামে পরিচিত।) ও তার চারদিকে দর্শকদের বৃত্তাকারে বসে পালা উপভোগ— সব মিলিয়ে কৌতূহলপূর্ণ পরিমণ্ডল। বাউদিয়া, ছোকরা, দুয়ারি/দোহারি চরিত্রেরা তো আদ্যন্ত নির্মল হাস্যরসের আধার। 'ঢাকোশোরী' পালায় শিষ্য পাঁচুর প্রতি গুরু গোঁসাইর উক্তি— "শুনরে পাঁচু অল্পবয়সে গসাইগিরি মোক সাজে না। অল্প বয়সে হনু গসাই, গোঁসাই সাজে না, মনটা কহচে পাঁচু কইনা জুড়িবা।"[১৭]

এই দৃশ্যপট চৈতন্য পদধূলিধন্য গৌড়-অঞ্চলের বৈষ্ণবীয় প্রভাবকে যেমন স্মরণ করায় তেমনি গোঁসাইয়ের চিত্ত চঞ্চলতা দর্শকদের তাৎক্ষণিকভাবে রঙ্গরস আস্বাদনের সুযোগ করে দেয়।

যে কথা দিয়ে বর্তমান আলোচনা শুরু হয়েছে আবার বৃত্তাকার পরিক্রমণরেখা ঘুরে সেখানেই যাওয়া যাক— সভ্যতার 'অস্বাভাবিক' অগ্রগতির ফলে মানুষ ক্রমশ হাসতে ভুলে যাচ্ছে অথচ হাসি মনুষ্য-বৃক্ষের শেকড়। শেকড়কে উপড়ে ফেলে বৃক্ষে জল সিঞ্চন— কালিদাসীয় পথ অনুসরণ। পরিবেশকে সজীব রাখার জন্য যেমন এক একটি বৃক্ষ নয় বনাঞ্চল প্রয়োজন তেমনি মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষের যূথবদ্ধ সামাজিক পরিচয় প্রয়োজন। লোকায়ত জীবন এখনো নানা সাংস্কৃতিক প্রকরণকে আশ্রয় করে সম্মিলিত থাকার প্রয়াস জারি রাখতে সক্ষম থেকেছে। বারোয়ারি আয়োজনে, দৈনন্দিন যাপনে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব স্থানিক সংস্কৃতিকে লালন করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের বহুস্বরিক আনন্দকে যেভাবে টিকিয়ে রেখে চলেছেন তা নাগরিক 'সভ্য সমাজে'র কাছে আশু শিক্ষণীয়। তা না হলে সেই দিন আসন্ন যেদিন 'জনশূন্য' এই পৃথিবীতে গ্রহান্তরের কেউ এসে গেয়ে উঠবেন—

> "কেন নিবে গেল বাতি
> আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে জাগিয়া বাসর রাতি,
> তাই নিবে গেল বাতি।।"[১৮]

তথ্যসূত্র :

১. ঘোষ, ড. অজিতকুমার, নাটকের কথা, সাহিত্যলোক, কোল— ০৬, সংশোধিত ৫ম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৪১২, পৃ. ১০১।
২. রায়, সুকুমার, রাম গড়ুরের ছানা, রচনা সমগ্র, পাঞ্চজন্য, কোল- ০৯, ১ম প্রকাশ, মে ২০১২, পৃ. ৩৫।
৩. দাশ, জীবনানন্দ, বোধ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কোল- ৭৩, ২য় ভারবি সংস্করণ, ১০ম মুদ্রণ, আগস্ট ২০০৩, পৃ. ১৯।
৪. চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কোল- ০৯, ৪র্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২২৯।
৫. সাহা, সমিত কুমার, প্রান্ত-দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি, পত্রলেখা, কোল- ০৯, ১ম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০৮, পৃ. ৬৮।
৬. ঐ, ৬৮।
৭. হক্, মহম্মদ রিয়াজুল, মালদহ জেলার লোকপ্রবাদ, লোকছড়া ও লোকধাঁধা সম্পর্কিত একটি নতুন অধ্যায়, মালদহ জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প.ব., কোল- ১২, ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০১৮, পৃ. ৩৮৬।
৮. ঐ, পৃ. ৩৮৭।
৯. ঐ, পৃ. ৩৮৩।
১০. ঐ, পৃ. ৩৮৫।
১১. দ্র. চক্রবর্তী, বরুণ, ঐ, পৃ. ২৪।
১২. সাহা, সমিত, ঐ, পৃ. ৭৬-৭৭।
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কোল- ১৭, পৌষ ১৪১০, পৃ. ৭৫৮।
১৪. সাহা, সমিত, ঐ, পৃ. ৫৮।
১৫. ঘোষ, প্রদ্যোত, মালদহ জেলার গম্ভীরা : উৎসব, মুখোশনৃত্য, গম্ভীরার গান তথা লোকনাটক, মালদহ জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, ঐ, পৃ. ৪৩০-৩১।
১৬. ঐ, পৃ. ৪৩২।
১৭. রায়, ধনঞ্জয়, খন, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প.ব., কোল- ১২, ১ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৮৯।
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, সাহিত্যম্, কোল- ৭৩, ১ম সাহিত্যম্ সংস্করণ, ১ বৈশাখ ১৪০৯।

সাক্ষাৎকার ও ব্যক্তিঋণ :

১. সরকার, নিমাই (৫৬), গ্রাম + পো. : দুর্গাপুর, কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৫.১২.২০১৯ ও ০৫.০১.২০২০।
২. সরকার, মাম্পি (২৩), গ্রাম + পো. : দুর্গাপুর, কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৫.১২.২০১৯ ও ০৫.০১.২০২০।
৩. রহমান, মোস্তাফিজুর (২৫), মাঝাপাড়া, পো. : বদলপুর, বংশীহারী, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৫.১২.২০১৯।
৪. বর্মন, নেমতা (৫৬), শেরপুর, পো. : খোকসা, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ২১.১২.২০১৯।
৫. বর্মন, উত্তম (২৫), শেরপুর, পো. : খোকসা, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ২১.১২.২০১৯।
৬. বর্মন, শরৎ (৩৩), মেহেন্দিগ্রাম, পো. : খলসি, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ২১.১২.২০১৯।
৭. বর্মন, সন্ধ্যা (৬৪), রাঙাপুকুর, পো. : রায়পুর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ২২.১২.২০১৯ ।
৮. বর্মন, নরেশ (৩৩), সোনাডাঙ্গি, পো. : রায়পুর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর, ২২.১২.২০১৯।